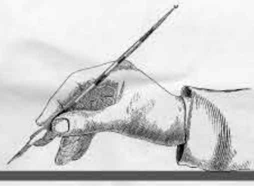
প্রজ্ঞাপন

> "দূর হোক যত বৈরিতা
> আর ক্ষমতার বাড়াবাড়ি,
> শান্তির বাণী ছড়াক বিশ্বে
> দ্বন্দ্বের সাথে আড়ি।"



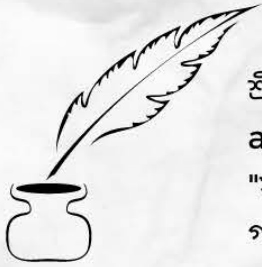
এবারে থাকছে

সূচীপত্র



সম্পাদকীয়

কবিতা



প্রশ্নোত্তরে যাজন



রেসিপি

প্রবন্ধ

স্মৃতিকথা

জীবনালেখ্য

স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা

প্রজ্ঞাপন ফেব্রুয়ারী ২০২২
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮
সম্পাদক
শ্রী প্রীতিগোপাল দত্তরায়
সহসম্পাদক
শ্রী সুখেন্দু পানি,
শ্রী অনুপ বৈদ্য
প্রকাশক
শ্রী পৃথ্বীশ কুন্ডু



মানুষ যেখানে এতখানি অবস্থার অধীন, সেখানে 'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে' কথার মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর- 'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে' এটা achieve (লাভ) করা লাগবে। তাই বলেছে "সর্ব্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গভীর ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে কালের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কালকে সংহিত করা লাগবে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে / বিংশ খণ্ড

দুঃখের মধ্যেও সুখকে পাওয়া চাই

শ্রীশ্রীঠাকুর- "মাঝে মাঝে আমাদের mind vacant হয়ই, কিন্তু এই vacancy or blankness আর depression , কিন্তু এক জিনিস নয়। vacant mind হয়, মনে হয় নির্জনে গিয়ে কাঁদি, যেন একটা উদাস ভাব, সেটা ভালই, আর নরকের মত depression সেটা বড় ভয়ঙ্কর। সুখের মধ্যে দুঃখের মধ্যে দুইয়ের মধ্যেই আনন্দ পেতে হবে। মৌমাছিকে দেখেছি, গুয়ের মধ্যে থেকে চিনি টেনে নিয়ে আবার মোম তৈরি করে। দুঃখের মধ্যে সুখকে পাওয়া চাই। ....ভজন করবেন, ঘরে জানালা দিয়ে ভজন করুন। যখন ভজন ভাল লাগে তখন ভজন করবেন, আবার যখন নামধ্যান ভাল লাগে তখন নামধ্যানই করবেন। ধ্যানের সময় আকাশ দেখতে পান না? আকাশ দেখলে দুঃখকে হজম করা যায়। Depression or vacant mind হলে দুঃখের সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবেন। সব কাজের মধ্যে নাম করবেন। যেমন কেউ গানের পদ গাইতে গাইতে কাজ করে, মাঝে মাঝে কাজে মন পড়লে গানটা ভুলে যায়, আবার খানিক পরে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে, নামও সেই রকম করতে হবে সব সময়েই। "

১৩ই জুন, ১৯২৩
গ্রন্থ- শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
লেখক- ব্রজগোপাল দত্তরায়।

সম্পাদকীয়

বসন্ত বিলাপ

শ্রী প্রীতিগোপাল দত্ত রায়

ফেব্রুয়ারি মাসে ফাল্গুন আসে। বসন্ত তারুণ্যের ঋতু, যৌবনের ঋতু। বসন্তের আলোকে পুলকে ঝলমল করে নূতন প্রাণের আশ্বাস। বসন্তের উদাসি হাওয়ায় ভালবাসার ফাগুন ওড়ে। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারি তিরবেঁধা বসন্তবাউরির আর্তরোলে সচকিত – ঘরে-বাইরে হিংসার যূপকাষ্ঠে প্রেমের সৎকার।

প্রথমে ঘরের দিকেই তাকানো যাক।

বহুকাল যাবৎ আমাদের দেশের রাজনীতি থেকে সেবা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য এবং যাবতীয় নীতি-নৈতিকতা বিদায় নিয়াছে। হিংস্র রাজনীতির বিকট ক্রুরতা মানুষের জীবন-বর্ধনকে নিষ্পেষিত করছে। প্রশাসন থেকে মানুষের বিবেক সবই রাজনীতির অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

এসবের কিছুই আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এবারের ফেব্রুয়ারিতে এক তরুণ ছাত্রনেতার মৃত্যু (হত্যা?) ঘিরে শাতন রাজনীতির যে উলঙ্গ উল্লম্ফন দেখলাম তাতে আমরা হতচকিত। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া জেলার আমতা গ্রামে গভীর রাতে এক তরুণের মৃত্যু হল। বসন্তের শুরুতেই আমাদের সমাজের একটি তরুণ পলাশ অকালে ঝরে গেল – এই বেদনার কোনও রাজনীতি থাকতে পারে না।

ওই তরুণের পরিবার পরিজনের একাংশ অভিযোগ করেছেন, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, আত্মহত্যাও নয়, এটা পরিকল্পিত হত্যা। মৃত্যু কী ভাবে হল, সেটা তদন্ত-সাপেক্ষ। রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছে। আশা করব সত্য উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু এই তদন্ত নিয়েই তো তদন্তের দাবি উঠে গেল।

ছাত্রনেতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ক'টা দিন সরকারের বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবাদ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠতেই সরকারের সম্বিত এল। তার পরেই তদন্ত দল গঠন। একটি তরুণের মৃত্যু, যাকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তার তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে হবে – এটাই তো স্বাভাবিক প্রশাসনিক দস্তুর। কিন্তু সরকারের প্রাথমিক টালবাহানা এই দস্তুরকেই শুধু বুড়ো আঙুল দেখাল না, সরকারের এবং ক্ষমতাসীন দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই একটা তীব্র সন্দেহের সৃষ্টি করে দিল। এই সুযোগে বিরোধী দলগুলি আওয়াজ তুলল, সত্যকে চাপা দিয়ে বিশেষ কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে না তো!

একে বিরোধীদের দুষ্ট রাজনৈতিক অভিসন্ধি এবং 'ঘোলা জলে মাছ ধরার অপচেষ্টা' বলে মনে করে সরকার এবং সরকারি দল। তা যদি হয়-ও, যদি সরকার এবং দলের উদ্দেশ্য সৎ ও সাধুও হয়, তথাপি তদন্ত নিয়ে প্রাথমিক টালবাহানা যে সরকারের প্রশাসনিক বিচক্ষণতা এবং যোগ্যতার পরিচায়ক নয়, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রাজ্যবাসী একটি তরুণের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের – জনমানসে যেমন, সরকারের কাছেও তেমনই। তার উপরে এই মৃত্যুর পিছনে রহস্যের অভিযোগ করছে ওই তরুণের পরিবার। রহস্যের তদন্ত, সত্যের উদ্ঘাটন, প্রকৃত দোষীর বিচার – সরকারের কাছে এটাই তো অপেক্ষিত। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকারের কোনও পদক্ষেপ যদি

জনগণের এই অত্যন্ত স্বাভাবিক আশাকে ব্যাহত করে এবং তার জন্য জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তবে তাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে ঘোষণা করে না-দিয়ে তাকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ করাই প্রকৃত রাজনীতি এবং সেটাই রাজধর্মের দাবি। তাই নয় কি?

অন্য দিকে বিরোধী দলগুলির বিরোধিতায় যে জঙ্গিপনার প্রকাশ আমরা দেখলাম, তাকেও কি আমরা সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলতে পারি? সরকার-কর্তৃক সিট গঠন এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের হস্তক্ষেপের পরেও প্রতিবাদের নামে যে তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করা গেল, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশ থানা এবং পুলিশকর্তার অফিস আক্রমণ চলল, বিক্ষোভকারীদের ইঁটের আঘাতে পুলিশকর্মীদের রক্তাক্ত হতে হল – তা কখনই সমর্থনীয় নয়। তরুণটির মৃত্যুর পিছনে যদি কোনও রাজনৈতিক বা অন্য কোনও স্বার্থ থেকে থাকে তা যেমন ও যতখানি গর্হিত, এই মৃত্যুকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টাও ঠিক তেমনই এবং ঠিক ততখানি নিন্দনীয়।

রাজ্যের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল তো আবার দেখা গেল বেশ ফ্যাসাদেই পড়েছে। একদিকে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার এই সুবর্ণ সুযোগটিকে তারা হাতছাড়া করতে চায় না। অন্যদিকে হতভাগ্য তরুণ ছাত্রটির

সম্প্রদায়-পরিচয়ের হিসেব-নিকেশ তাদের গলা খুলে প্রতিবাদ করতে বাধা দিচ্ছে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গলের সহজ হিসাব যখন রাজনীতির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়, তখন রাজনীতির প্রসাদ মানুষের পক্ষে বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এবারের ফেব্রুয়ারি সেই সত্যের জানান দিল।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে একটি শিশুমৃত্যুর জন্য রাজাকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি এবং প্রজাদের দুর্ভোগের জন্যও দায়ি হয়েছিলেন স্বয়ং রাজা। প্রজাকুলের মনের প্রশ্ন ও সন্দেহ দূর করতে অকলঙ্ক সীতাদেবীকেও অগ্নিপরীক্ষায় পাঠিয়েছিলেন রাজা। এই হল ভারতের রাজধর্ম। যেখানে রাজা – "প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ"। প্রকৃতি-রঞ্জন বা প্রজাকুলের পরিপূরণই রাজধর্ম। বর্তমান যুগের রাজনীতি থেকে জনগণের পরিপূরণের আদর্শটি সম্পূর্ণ উধাও।

*****

এ বার একটু ঘরের বাইরে চোখ রাখি।

এই ফেব্রুয়ারিতেই বিশ্ব সাক্ষী থাকল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের। প্রতাপশালী রাশিয়া আক্রমণ করল পর্শী ইউক্রেনকে।

আমরা আধুনিক যুগের গর্ব করি। সভ্যতার অগ্রযাত্রার বড়াই করি।গলার শিরা ফুলিয়ে মানবতার জয়ধ্বনি করি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যুদ্ধ-নামক মানবতাবিরোধী চরম অভিশাপকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হল না।

অথচ কালপরম্পরায় চেষ্টা তো কম হল না। কত মনীষী, কত দেশনেতা শান্তির পক্ষে সওয়াল করলেন। মানুষের জীবনকে নিরঙ্কুশ করতে কত আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহু-দেশীয় মঞ্চ ইত্যাদি গঠিত হল। দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রশমিত করতে কত সনদ স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু আজও একবিংশ শতকের পরিণত মানব-সভ্যতা যুদ্ধের করাল কবল থেকে মুক্তি পেল না।

যুদ্ধ মানেই রক্তক্ষয়, যুদ্ধ মানেই জীবনহানি, যুদ্ধ মানেই উন্মত্ত ধ্বংসলীলা। সত্তা না কি সচ্চিদানন্দময়! সত্তা না কি অসৎ-নিরোধী স্বতঃই! মানুষ না কি চায় বাঁচতে আর বাড়তে! অস্তি-বৃদ্ধিই না কি তার আদিম চাহিদা! দুটি দেশ যখন নির্বিকার দম্ভে ঘোষণা করে প্রতিপক্ষের উপর কে কত বড় আঘাত হানতে সক্ষম হল, শত্রু-দেশের কত সেনা কত মানুষের সংহার হল, কত ব্যাপক ধ্বংসের নির্লজ্জ স্বাক্ষর অঙ্কিত হল, – সেই সব হিংস্র কোলাহল শুনতে শুনতে মানুষ হয়েও মনুষ্যত্বের অহঙ্কার নিমেষে নিশ্চিনহ হয়ে যায়।

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের বর্তমান সঙ্কট একদিনের সৃষ্টি নয়। বহু দিন ধরে ধূমায়িত শক্তির দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম এই হিংস্র অগ্ন্যুৎপাতের। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং ব্যবচ্ছেদের পর মনে করা হয়েছিল ‘ঠাণ্ডা লড়াই’-এর যুগ বুঝি শেষ হল।

কিন্তু অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ও প্রতিযোগিতা, সামরিক ভারসাম্য এবং ভূ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এই লড়াই শেষ হতে দিল না। ছাইচাপা আগুনের মতো টানাপোড়েন বেড়েই চলল। টানাপোড়েনের একদিকে পশ্চিম বিশ্ব – আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, অন্য দিকে রাশিয়া।

একদিকে পশ্চিম বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অহংকার, আগ্রাসন, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে বিশ্বকে একচেটিয়া শাসনের অদম্য লোভ, অন্যদিকে সোভিয়েত-পরবর্তী রাশিয়ার আহত স্বাভিমান। এদিকে আবার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে চিনের দ্রুত উত্থান এবং রাশিয়ার বিশাল বাজারের দিকে চিনের দৃষ্টি পশ্চিম বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিল। আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ মনে করল রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে হবে। সে জন্য তাদের নজর পড়ল পূর্ব ইউরোপের সাবেক সোভিয়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, রাশিয়ার লাগোয়া অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির উপরে। বিশেষ করে ইউক্রেনের মতো যে-রাষ্ট্রগুলিতে রাশিয়া-বিরোধিতার স্বর উচ্চকিত, তাদের ব্যবহার করে রাশিয়াকে চাপে রাখার কৌশল নিল পশ্চিম বিশ্ব। কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত ইউক্রেনের কাছেও পশ্চিম বিশ্বের সাহচর্য যথেষ্ট লাভজনক বলে পরিগণিত হোল।

পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে ইউক্রেনের নৈকট্য, এবং বিশেষ করে ইউক্রেনের ন্যাটো-য় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তুতি রাশিয়াকে স্বভাবতই বিচলিত করল। ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত ভাবে ইউক্রেনের ন্যাটো-য় অন্তর্ভুক্তি রাশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক।

এই অবস্থায় ইউক্রেনকে একটা সবক শেখানো রাশিয়ার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। তারই ফলশ্রুতি এই যুদ্ধ। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের মূলে যে পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, তা বোঝা যাবে ইউক্রেনকে দেওয়া রাশিয়ার যুদ্ধবিরতির শর্তগুলির দিকে তাকালেই। শর্তগুলি থেকে স্পষ্ট রাশিয়ার মূল দাবি হল পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে ইউক্রেনের নৈকট্য রদ।

তা হলে দাঁড়াল কী? বিশ্বের এই অনবশেষ যুদ্ধ, হিংসা, মৃত্যু, ক্ষয়, ক্ষতি সব কিছুর মূলে অহঙ্কার লোভ লালসা আগ্রাসন – অদম্য গতিতে যা ধেয়ে চলেছে মানুষের শিরায় শিরায় "তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া, তুচ্ছ করি জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া"। "স্বার্থে-স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে-লোভে ঘটেছে সংগ্রাম।" সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি – প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যতই জোরদার করা হোক, মানুষের ভিতরে বাসা-বাঁধা প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতা থেকে মুক্তি না পেলে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই।

এই প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতার কথাই কি কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "পৃথিবী" কবিতায়, "আধপোষা নাগদানব" অভিধায়? –

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা –
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে!
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে –
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।।

কবিতা

জীবন যেমন

শ্রীমতী শ্রীধারা দাস

হাতটা দিয়ে ধরতে গিয়েও
ছিটকে গেল খাতা।
টলমলে ওই হাতে কি আর
আছে সেই ক্ষমতা?

ব্যাটটা ধরে ছক্কা মেরে
বলটি মাঠের পার
এই হাতেরই জোরে তখন
চলতো সাধের সংসার।।

মনের মাঝে কতো আশার
ফুলঝুরি যে ফোটে,
বাসবে ভালো, ঘুচবে কালো
সংসার সাগরতটে।

নিত্য যে তাই উজাড় করে
সবটুকু দেয় ঢেলে,
কেবল সেথায় চাওয়া-পাওয়ার
হিসাব, তাকেই ভুলে।

এই চলারই গতির মাঝে
বিবেক চেতন যদি
পাক দেওয়া ওই ঘূর্ণি স্রোতেও
পার হওয়া যায় নদী।।

কেন্দ্রবিন্দু ভালোবাসার
যদি হন করুণা সিন্ধু,
জীবনটারে মাখবে গায়ে
প্রেমের রঙেই কিন্তু।।

কবিতা

পরম বন্ধু

শ্রী অনুপ বৈদ্য

ভালবাসার মূর্ত্ত প্রতীক পরম প্রেমময়
প্রেম অবতারে আসো তুমি ওগো তোমারই হউক জয়!
তুমিই সত্য, তুমিই যে প্রেম, তুমিই যা কিছু সব
মানুষ প্রকৃতি গাছপালা যত, পাখীদেরও কলরব।
তুমি ছাড়া কভু বহেনা জীবন প্রভু এই ধরাতলে,
করুণাধারায় ভরাও জীবন প্রেমেরই অশ্রুজলে।

মানুষের মাঝে মানুষ হয়েই লীলায়িত তুমি ভবে
আশা দাও তুমি বন্ধু সখা হে মানুষেরই জয় হবে!
প্রকটিত তুমি সব সত্তায় সৃষ্টি যা কিছু আছে,
তোমারে আপন করেছে যে-জন আছো তুমি তার কাছে।
প্রতিটি জীবন তোমার কাছে আপনার চেয়ে দামী,
দোষ ছেড়ে কর গুণের কদর তুমি অন্তর্যামী।
তোমার মতন পরম বন্ধু ত্রিভুবনে কেহ নাই
রব না যেদিন সংসার-মাঝে (তব) চরণেতে দিও ঠাঁই।

কবিতা

একটি কোকিল

শ্রীমতী শ্যামলী দাস

ভোরের কুয়াশা মেখে
নিরালায় বসে বসে
একান্তে চলেছে ডেকে
একটি কোকিল।

নিঝুম দুপুর শেষে
গোধূলির আলোয় মিশে
সুরেলা কুহু তান,
বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে
সুরের মূর্ছনায়
আচ্ছন্ন করেছে প্রাণ
একটি কোকিল ।

দূরে কোনো গাছের ডালে
অলক্ষ্যে অন্তরালে
একান্তে চলেছে ডেকে
একটি কোকিল।
এত সুর এত গান
স্বর্গীয় কুহু তান
কোথা হতে পেল প্রাণে
অফুরন্ত অবিরাম
একান্তে চলেছে গেয়ে
একটি কোকিল।

ক্ষোভহীন দুঃখহীন
নির্ভয় ক্লান্তিহীন
উদ্দাত্ত সুর ঢেলে
শান্তি আনে অবহেলে
অলক্ষ্যে অদৃশ্য থাকা
একটি কোকিল ।

কবিতা

করুণাময়ের কৃপা

শ্রীমতী পলি ঘোষাল চক্রবর্তী

প্রভু করুণাময় জয় হোক তোমার, জয় হোক।
মণি মাণিক্য দিয়েও মেলে না তোমার অহৈতুকি কৃপা অমোঘ।
অপ্রাকৃত লীলা তব কে বোঝে তা,
জগৎ-গুরু তুমি যে মূলাধার গভীরতা।
অতি দীন, হীন আমি লীলা তোমার বুঝতে পারি না কোন,
হৃদয় জুড়ে জোৎস্না তোমার মোহন।
পরম ধাম তোমার প্রিয় প্রশান্ত প্রেম ঝরে যেথায়,
অবিরাম গন্ধর্ব সুরে ভরে থাকে তাই।
নামের যাদুকর নামের নামী,
সবখানে দেখি মহিমান্বিত তুমি!
বিশ্বাসের বিশ্বে তুমি বিশ্ব নাথ,
করুণা ছাড়া পিতার আমি যে অনাথ।
পিতা তুমি, মাতা তুমি, বন্ধু ও সখা,
যোগৈশ্বর্য তুমি আমার পরম আশ্রয় একা।
করুণাময়ের কৃপা মাথার উপর থাকুক,
পরম প্রেমের আনন্দ বাজারে আমার সকল বেলা কাটুক।

জীবন জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ১. ইষ্ট কর্ম বলতে কি বোঝায়? আমরা যে সকল কর্ম করি সেখানে কি ইষ্ট কর্ম করা হয়? হলেও তা কেমন ভাবে হয়?

উত্তরঃ সত্তাপোষণী ও ইষ্টের নিদেশবাহী যে কোনও কর্মই ইষ্ট কর্ম। আমরা প্রত্যহ যে কর্ম করি তা যদি ইষ্টের নিদেশবাহী এবং নিজের ও অন্যের সত্তাপোষণী হয় তাহলেই তা ইষ্ট কর্ম বলে অভিহিত হবে।

'ইষ্ট' শব্দের অর্থ মঙ্গল, তাই ইষ্টকর্ম বলতে সেই সমস্ত কর্মকে বোঝায় যেগুলি সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাতে নিজের মঙ্গলও বাদ পড়ে না। আমরা যে সমস্ত কাজ করি তার সবটা তখনই ইষ্টকর্ম হয়ে উঠবে যখন সেগুলি কোন না কোন ভাবে আমাদের অস্তিত্বের পোষণ দেবে। আর তেমনটা না হলে সেগুলি হবে আমাদের বৃত্তিস্বার্থজ কর্ম, তাতে প্রকৃত মঙ্গল নিহিত থাকে না।

প্রশ্ন ২ - শ্রীশ্রীঠাকুর কোথাও বলেছিলেন যে একদিন আসবে যেদিন সৎসঙ্গে অর্থের কোনো অভাব থাকবে না আর সেই দিনই সৎসঙ্গের জন্য সব থেকে বিপদের দিন. আপনাদের কি মনে হয় সৎসঙ্গের কি সেই দিন আজ উপস্থিত?

উত্তরঃ - হাঁ। ঐ দিন আগত প্রায়। আজ দেখা যাচ্ছে এক একজন ঋত্বিককে কেন্দ্র করে এক একটা সংস্হা গড়ে উঠছে। অনেক পৃষ্ঠপোষকও জুটে যাচ্ছে। সকলে বলছে আমরাই একমাত্র তাঁকে অবিকৃত ভাবে পরিবেশন করছি। তাই যদি হয় তাহলে সমাজে অরাজকতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে কেন?

প্রশ্ন ৩ - ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য ঠাকুরবাড়ি ছাড়া আর কোথাও কি পাঠানো যায়?

উত্তরঃ - ইষ্টভৃতির টাকা ইষ্টস্হানে পাঠানোর কথা বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, ঠাকুরবাড়িতে নয়। এও বলেছেন সারা দুনিয়াটা ইষ্টস্হান হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন ৪- শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম প্রচারের জন্য আমাদের কিভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ - শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনাম প্রচারের জন্য সর্বাগ্রে আমাদের আচরণশীল হয়ে উঠতে হবে। শুধুমাত্র উৎসব ও বক্তৃতা করলে হবে না। আমাদের আচরণ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ যখন সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে তখনই হবে প্রকৃত সৎনামের প্রচার ও প্রসার।

প্রশ্ন ৫ - প্রকৃত সেবার অর্থই কি পরমপুরুষের সেবা?

উত্তরঃ - প্রকৃত সেবার অর্থ বৃত্তিভেদী টান নিয়ে মানুষের মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করা।

প্রশ্ন ৬-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন যে আমাকে স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করে সে আমাকে প্রাপ্ত হয়. কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন যে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করলেও তাঁকে প্রাপ্তি নাও ঘটতে পারে তবে সদ্গতি হয়। এই দুজায়গায় দুরকম কথা কেন?

উত্তরঃ - পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কথাই বলেছেন যে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করলে তাঁকে পাওয়া যাবে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন টিয়া পাখি খুব রাধে কৃষ্ণ বলে কিন্তু বিড়ালে ধরলে তখন সব ভুলে গিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। আমরাও তাঁকে বহন করে না চললে আপৎকালে তাঁর কথা স্মরণে আসে না। আসে কষ্টের কথা। মৃত্যুর কষ্টকে অতিক্রম করে তাঁর স্মরণ কি মানুষ করতে পারে?

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন -

". মৃত্যু কালে যে ভাব ধরে
ছেড়ে শরীর যায় জীবন
জন্মে আবার তেমন স্হানেই
সেই ভাবের পথ পায় যখন।"

দুটো কথার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। শুধুমাত্র ভাবের বিভিন্নতা।

দ্বাপর যুগে মানুষের মধ্যে বোধ হয় ভক্তিভাব বেশি ছিল তাই হয়ত শ্রীকৃষ্ণ অমন করে বলেছিলেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর কলিযুগের বৃত্তিমুখী মানুষের ভক্তিভাব অনুযায়ী যুগোপযোগী করে একই কথাই একটু অন্যভাবে বললেন।

প্রশ্ন ৭ – 'শরণাগত' কথাটার অর্থ কি?

উত্তরঃ- 'শরণাগত' মানে উর্জ্জীভক্তিপরায়ণ, হনুমানের মত জীবন্ত ভক্তি যার আছে।

প্রশ্ন ৮-শ্রীশ্রীঠাকুরের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রের স্বাদ আমরা এখন কিভাবে পেতে পারি?

উত্তরঃ - যতখানি অনুরাগ নিয়ে তন্নিষ্ঠ হয়ে চলতে পারবো ততই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো।

"অদ্যাবধি লীলা করে সেই গোরা রায়, কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

প্রশ্ন ৯ - মানুষকে যখন তিনি সাবলম্বী ভাবে চলার অধিকার দিয়েছেন তখন মানুষ কেন তাঁর ওপর নির্ভর করবে?

উত্তরঃ -মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বৃত্তি পরামৃষ্ট চলনে চলে। তাঁকে গ্রহণ না করলে বৃত্তির গায়ে হাতই পড়ে না। এমনতর মানুষেরা নিজের এবং অন্যের দুর্ভোগের কারণ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১০ -সদ্গুরু কি একমাত্র পুরুষোত্তমই হতে পারেন?

উত্তরঃ - হাঁ পুরুষোত্তমই একমাত্র সদগুরু হতে পারেন। কারণ তিনিই একমাত্র পূর্ণ। বাকি সকলেই আংশিক।

প্রশ্ন ১১ -ঈশ্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যু কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরঃ - আমার মনে হয়, অবশ্যই জন্ম, কারণ দেহ না থাকলে সাধনাই বা সম্ভব কি করে, আর ঈশ্বরপ্রাপ্তিই বা কেমন করে সম্ভব!
ঈশ্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জন্মটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেহ ধারণ না করলে বিবর্তন হয় না। ধারণ পালনী সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠা যায় না।

প্রশ্নকর্তা - শ্রদ্ধেয় রাজকুমার মান্না ও শ্রদ্ধেয় গোপাল মন্ডল।
উত্তর দাতা - শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুখেন্দু পানি ও শ্রদ্ধেয় অনুপ বৈদ্য।



ধারাবাহিক প্রবন্ধ

আর্য্য দশবিধ সংস্কার

ডাঃ তপন দাস

পর্ব-৮

< অনুরাগ < বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ < ধৃতি সহানুভূতি <সংহতি < শক্তিঃ মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা প্রাকৃতিক নিয়মের বশে জীবধর্ম পালন করে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তাই পূর্ণ। নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক হতে পারে, স্ব-স্ব ভাগ্যবিধাতা হতে পারে প্রবৃত্তিবশী বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির প্রয়োগে হিটলার হতে পারা যায়, কিন্তু বিবেকানন্দ হওয়া যায় না। বিবেকানন্দ হতে গেলে মাথার উপর মাথা বসাতে হয়। বুদ্ধিকে শুদ্ধি করতে হয় বিশ্ববিধাতা পরমপিতার জীবন্ত আদর্শের বোধের মাধ্যমে। আদর্শ মানে আয়না। নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে প্রয়োজন হয় একটি মাত্র স্বচ্ছ আয়নার, একাধিক নয়। অনুরূপ, অন্তর্নিহিত সত্তাকে দেখতে প্রয়োজন একজন প্রবৃত্তিবশী জীবন্ত আদর্শের। তাই, একমাত্র ইষ্টগুরুর আদর্শের আলোকেই আলোকিত করা সম্ভব সত্তাকে। ওই ইষ্টাদর্শকে বিধিবৎ গ্রহণ করার নাম দীক্ষা। (একাধিক প্রতিকৃতির সন্মুখে দীক্ষা গ্রহণ এবং সাধন ভজন ইষ্টবিধির অপলাপী।) দীক্ষার অনুশাসনবিধি কামনা, বাসনা জর্জরিত বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সত্তাধর্মী করে তুলতে সাহায্য করে। বন্ধুরূপী শত্রু লোভ, কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলো 'স্বতঃ-অনুজ্ঞা'র অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে ধৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় সত্তায়।

আদর্শ স্বরূপ 'বড় আমি'র আলোকে 'ছোট আমি' আলোকিত হয় সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হওয়া চাঁদের ন্যায়। জন্ম নেয় পক্ষপাতমুক্ত সহানুভূতির। বৃহত্তর পরিবেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সদস্যদের প্রতি সানুকম্পী দরদী মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে। 'ঘটে ঘটে ইষ্টস্ফূরণে'র নেশার মৌতাতে সংহতি দানা বাঁধে অন্তরে, বাহিরে। ব্যষ্টিসহ সমষ্টি জীবনে সত্তার সুপ্ত শক্তি বিকশিত হয়। শক্তির বিহিত প্রয়োগে মানুষ কাঙ্খিত জীবনবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সম্বর্দ্ধিত হয় সমাজ, রাষ্ট্র।

শক্তি < সম্বর্দ্ধনাঃ

'সম্বর্দ্ধনা' শব্দের অভিধানগত অর্থ—পূজা, সাদর অভ্যর্থনা, সম্যকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। কোন কারণে সাদর অভ্যর্থনায় ত্রুটি হলে মানুষের অহং আহত হয়ে গ্রহদোষ বা গ্রহণদোষের সৃষ্টি করে। মানুষ মানুষের শত্রু হয়ে ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি আমাদের শরীর বিধানের ভ্রূণাণু-কোষ শুক্রাণু কোষকে যে ভাবের অনুরণনে গ্রহণ করে সম্বর্দ্ধিত করবে বা পূজা করবে তেমন ভাবের অনুরণনে কোষ বিভাজিত হয়ে জীবনের স্পন্দন সম্বর্দ্ধিত হবে অথবা সংকুচিত হবে। জীবনকে পূজা করার ওই উপাচারের বিহিত প্রয়োগেই পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, শুদ্ধাত্মা, ভাল মানুষ জন্মায়।

আবার ওই উপাচারের অবিহিত প্রতিলোমাচারের প্রয়োগে বিক্ষুব্ধ সত্তা মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত হয়ে জন্ম দেয় আতঙ্কবাদের, ভ্রষ্টাচারের, রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয় পরবশ স্বভাববিধ্বংসী মানবশিশুর। আবার কোষ বিভাজনের ওই সম্বর্দ্ধনায় ত্রুটি থেকেই কর্কট-কোষের সৃষ্টি হয়।

তাই, অসুস্থ মানুষের আমদানি কমাতে হলে ঋষির বিধানে জৈবধর্মের পুজা করার বিধি শেখাতে হবে জনগণকে। যে পূজার পূজারী হতে হবে নিজেকে, নিজেকে সম্বর্দ্ধিত করার জন্য, নিজত্বের নৈবেদ্যর ডালি সাজিয়ে,—যা' আর্য্যবিধির দশবিধ সংস্কারে বর্ণিত হয়েছে।

ধৃতি < প্রণিধান < সমাধি < কৈবল্যঃ

ব্যষ্টি জীবনে অর্জিত ধৃতি সত্তায় কেন্দ্রায়িত হয়ে জীবনকে আত্ম সমাহিত করে ঈশ্বরপ্রাপ্তির গন্তব্যে। তৃষ্ণার বা প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছার বা আকাঙ্খার অবসান হয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় নিবিষ্ট হয়। চেতনা চিরচেতনে, চিরচেতন মহাচেতনে সমুত্থিত হয়। মৃত্যু অবলুপ্ত হয় অমৃতে। জীবাত্মা মিলিত হয় পরমাত্মায়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "পরমাত্মা হল সেই জিনিস যার উপর যাবতীয় জীবাত্মা দাঁড়িয়ে থাকে। পরমাত্মা যেন সমুদ্র আর জীবাত্মাগুলি যেন তার রকমারি তরঙ্গ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ। জীবাত্মা মানে প্রবৃত্তি সমন্বিত সত্তা। পরমাত্মার মধ্যে কোন বিকার নেই। মানুষ যখন প্রবৃত্তিগুলির সত্তাপোষণী বিনিয়োগে সিদ্ধ হয়, প্রবৃত্তিগুলি যখন তাকে বিকার-বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, তখন তার জীবনগতি পরম স্বাচ্ছন্দ্য-লাভ করে । এমনতর চলনের ভিতর দিয়েই হয় পরমাত্মার উপলব্ধি।" (আঃপ্রঃ ১১/১৮/৩/১৯৪৮)

যত সহজে কথাগুলো লিখলাম, তত সহজে ওগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সাধনা। জৈবিক তাগিদগুলোকে জীবনধর্মী করে তোলার জন্য সত্তাপোষণী নিরামিষ আহার গ্রহণ আবশ্যিক। অষ্টমী, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাদি পর্বদিনগুলোতে ব্রত করা। বর্ণাশ্রম-পোষণী কর্মদ্বারা পরিবেশকে পোষণ দিয়ে জীবিকা নির্বাহের অভ্যাস আয়ত্ত করা। সহবাস-বিধি মেনে গর্ভাধান সংস্কার পালন। আত্মহত্যার পাপ থেকে নিস্তার পেতে গর্ভাধান ব্যতীত শুক্রাণুর অপ-বিনিয়োগ করে আত্মার অপমৃত্যু প্রতিরোধ করার চেষ্টা। ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন অভ্যাস। সব মন্দিরের চাইতে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই শ্রীবিগ্রহমন্দির স্বরূপ দেহমন্দিরের গর্ভগৃহের আজ্ঞাচক্রে ইষ্টগুরুর স্থায়ী আসন নির্মাণ। কাজকর্ম, চলাফেরা, এমনকি অবচেতনেও 'অজপা' নামে নেশা করতে পারলে আর চিন্তা নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত জীবনবর্দ্ধনার অনুশাসনসমূহ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার,— যা' 'পঞ্চবর্হি', 'সপ্তার্চ্চি' ও 'জাতীয় জীবনে পঞ্চদশী' (দ্রঃ 'সন্বিতী' গ্রন্থ)-র অনুশাসনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ওগুলোকে বাস্তবে মূর্ত্ত করে তোলাই মানবজীবনের চরম সাধনা। শ্রীশ্রীঠাকুর ওই সাধনার মাধ্যমে আমাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করতে চেয়েছিলেন। 'মরোনা, মেরোনা, পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো।'—বাণীকে সার্থক করতে। তবুও কেন জানিনা, আমরা ক্রমেই যেন মৃত্যুর মিছিলে যোগদান করতে এগিয়ে চলেছি প্রবৃত্তির শয়তানী প্ররোচনায়। যৌন অত্যাচার, মারামারি, হানাহানি, অযথা লোকক্ষয় ইত্যাদি অনভিপ্রেত ঘটনাসমূহ সংবাদের শিরোনাম দখল করে নিয়েছে। সব দেখেশুনে মনে পড়ে যায় মহাভারতের সেই বিখ্যাত উক্তি, যুধিষ্ঠির বলেছিলেন বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরেঃ জীবগণ প্রতিনিয়ত কালচক্রে নিপতিত হচ্ছে দেখেও মানুষ অন্যায়, অধর্ম করে চিরদিন বেঁচে থাকতে চায়, এটাই সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়।

[ক্রমশঃ]

স্মৃতি কথা

কেমনে বর্ণিব

শ্রীমতী দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

সালটা ১৯৯৯, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্টের অপেক্ষায়। ছোটবেলাটা বেশীর ভাগই মামার বাড়িতে কেটেছে আমার। একান্নবর্তী পরিবার, অনেক দাদু, অনেক দিদা, অনেক মামা, অনেক মাসি। যখন যিনি সময় পেতেন আমাকে নিয়ে চলে যেতেন। মামারা অফিস থেকে ফেরার পথে জল খাবারটা আমার মায়ের হাতে বানানো সকলের প্রিয় মুড়ি মাখা ও চা খেয়ে তবে বাড়ী ঢুকতেন, কোন কোনদিন সাথে আমি ফাউ। না নিয়ে গেলে সাইকেলের পেছনে দৌড়াতাম। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে যাওয়াও কমতে থাকলো। মা'র সাথেই যেতাম। উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে ভাবলাম অনেকদিন মামারবাড়ী গিয়ে থাকি নি। এক সপ্তাহের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে গেলাম। শুক্রবার গেলাম, শনিবারের রাত কাটতে না কাটতে আমার বাবা নিতে চলে গেলেন। আমাকে ছেড়ে আমার বাবা থাকতে পারতেন না। আজ ভাবি, সাত বছর হয়ে গেল, আমার বাবা চলে গেছেন, এখন কেমন ক'রে আছেন। হয়তো বা কখনও অন্য কোথাও অন্য কোন রূপে দেখা হবে। কিন্তু আমার বাবা হয়েও যদি আবার দেখা হয়, মনে কি থাকবে? যাই হোক, বাবার সাথে বাড়ী ফিরলাম, পরীক্ষার পর অত দিনের ছুটিটা বাড়িতে, রেজাল্ট বেরোনোর সময়ও হয়ে এসেছে। তাই আমার মাসীমণি, মামী, কাকারা সবাই ডাকতে লাগলেন, বললেন ঘুরে যেতে, কলেজে ভর্তি হলে তো হঠাৎ করে যাওয়া হয়ে উঠবে না। তাই ঠিক হলো এক শনিবার সকাল সকাল মামার বাড়ি গিয়ে ওখান থেকে বিকেলে আমার দেশের বাড়ী ঘুরে পরের দিন রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগরে ফিরবো।

সেই অনুযায়ী মামার বাড়ী গেলাম প্রথমে। আমার দিদা তখন শয্যাশায়ী, প্রায় আট বছর তিনি বিছানায়, সেই সময় কথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইশারায় বলতেন সব। আমি দিদার খুবই আদরের। দিদা আমাকে পুতুল বলে ডাকতেন। সারাদিন মামার বাড়িতে কাটিয়ে বিকেলের দিকে আমার গ্রামের বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দিদার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে যখন বলছি আমরা আসছি, দেখি দিদার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, আর আমার হাত চেপে ধরে আছে, কিছুতেই ছাড়ছে না। যেতে দেবে না। মাসীমণি তাই দেখে বার বার বলতে লাগলো ছাড়ো , ওদের দেরী হয়ে যাচ্ছে, বাস চলে যাবে। কিন্তু আমার হাতটা চেপে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমারও খুব কষ্ট হল, মাকে একবার বললামও আজ থাকি না, কাল যাব। কিন্তু কাকা, কাকীমাদের বলা ছিল তাই মা রাজি হলো না। তাছাড়া আমার বাবাও অফিস ফেরতা সোজা আমাদের গ্রামের বাড়ীতেই যাবেন, সেই রকমই সব ঠিক ছিল। দিদার মুখটা মনে করে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমন তো এর আগে কোনদিন করেন নি।

সন্ধ্যার আগেই দেশের বাড়ী পৌঁছুলাম। সেদিনটা বাড়ীতে থেকে পরের দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ রবিবার চন্দননগরে ফিরলাম।

রবিবার রাত কেটে সোমবারের সকাল, যথারীতি আমার বাবা অফিস চলে গেলেন। বিকেলের দিকে আমার ছোট মামা, যিনি চন্দননগরেই থাকেন, চন্দননগর কলেজের কেমিস্ট্রির প্রফেসর, তিনি এসে বাইরে থেকেই ডাকাডাকি করতে লাগলেন, আমি আর মা বেরোলে মামু জানালো, দিদা আর নেই।

মামুর কাছে কলেজেই খবর এসেছে। তাই মামু চলে যাচ্ছেন। মাকে বললেন তোরা মানে আমার মামী, মামার মেয়ে, মা আর আমরা দুই বোন একসাথে যেন চলে যাই। আর আমাকে মামীর ওখানে পাঠিয়ে দিতে, মামী একা গুছিয়ে নিতে পারবেন না, আমি যেন গিয়ে সাহায্য করি। এই বলে মামু ট্রেন ধরার জন্য রওনা হলেন। আমার মা সাথে সাথে আমার বাবাকে অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলেন। আমিও সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মামুর বাসার দিকে। মামুরা তখন গঙ্গার ধারেই একটা বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। আমি পৌঁছে মিমির (ছোট মামীকে আমি মিমি বলে ডাকি) হাতে হাতে সব গুছিয়ে, আমার সাইকেলটা মামুর বাসায় রেখে একটা রিক্সা করে আমি, মিমি ও মামুর মেয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। ওদিকে আমার মা সব গুছিয়ে বোনকে নিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা যখন রওনা হলাম তখনই আকাশের মুখ ভার। কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। আষাঢ় মাস। ষ্টেশনে পৌঁছুনোর পরই তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। এত বৃষ্টি যে দশ হাত দূরের মানুষ দেখা যাচ্ছেনা। ক্রমশ বৃষ্টি বেড়েই চলল। লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠবো বলে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। লেডিসে উঠেই দেখি একদল ছেলে বসার সিটের ওপর পা তুলে বসে আছে। পা সরাচ্ছে না, বসতেও দিচ্ছে না। লেডিস কম্পার্টমেন্টে ছেলে গুলোকে দেখে আমার মা ও মিমি রেগে গেল, তার ওপর পা সরাচ্ছে না দেখে আমার মা ওদের বললেন লেডিসে কেন উঠেছে। ছেলেগুলোর পাশ থেকে একজন মাঝ বয়সী মহিলা যিনি ওদের সাথেই ছিলেন, তিনি উল্টে জোর গলায় কথা বলতে লাগলেন। তারা যে ভুল কিছু করেনি সেটাই প্রমাণ করতে চাইলেন।

একটা পুরো দল, দেখে মনে হল, জেলে সম্প্রদায়, সাথে মাছ ধরার বিভিন্ন সামগ্রী দেখলাম। আমার মা ও মিমি প্রতিবাদ করতে লাগলেন। আমার ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছিল না। বার বারই মাকে বলছিলাম, মা চুপ কর। ওদের হাবভাব, ভঙ্গী খুবই অস্বস্তিকর লাগছিল। ব্যান্ডেল আসতে আসতে বাকী যারা ছিলেন, তারা নেমে যেতে লাগলেন। ট্রেন ব্যান্ডল পৌঁছুলে একজন মহিলা বসেছিলেন, তিনিও নেমে গেলেন। এখন শুধু আমরা পাঁচ জন আর ঐ দলের জন চার-পাঁচ ছেলে আর দুই কি তিন মহিলা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, থামবার নামই নেই। মাঝেমধ্যে ওরা বিভিন্ন বাজে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর তার উত্তরে আমার মা ও মিমি জবাব দিচ্ছে, যত আমি মানা করি চুপ কর না, যা বলছে বলুক। ওদের আকার ইঙ্গিত দেখে আমি ভয়ের সঙ্কেত পাচ্ছিলাম। আর সেটাই হল। ব্যান্ডেল থেকে ট্রেন যেই ছাড়লো একটা ছেলে উঠে গিয়ে ট্রেনের সব জানলা, এমনকি দরজা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। আর ঐ মাঝবয়সী বলতে লাগলো, তুলে নিয়ে যাব। দেখি কেমন করে নামে। দুটো ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। একটা আমি ধারের দিকে যে সিটে বসে তার ঠিক পেছনে হেলান দিয়ে। আর একজন ঠিক আমার উল্টো দিকের সিটে। নোংরা, হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে আর গান গাইছে। তখনো ও আমার মা ও মিমি বলে যাচ্ছে কি করবে কি, দরজা খুলে দাও। আমি প্রমাদ গুনলাম।

সামনের ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বোঝালাম বটে আমি ভয় পাই নি। কিন্তু সত্যি সত্যিই ভেতরে কাঁপতে লাগলাম। নাম, নাম, শুধু নাম। সেদিন ভরা সভায় একমাত্র এই নামই বাঁচিয়েছিল দ্রৌপদীকে। একমাত্র সেই জনার্দনই উপায়। তাই প্রাণপনে নাম করতে লাগলাম। আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, তালান্ডু একে একে পার হলো, ঠায় ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। মা মাঝেমাঝেই বলছে দরজা খোল। মায়ের কথায় ওরা হাসাহাসি, মজা করছে। তালান্ডু পেরিয়ে খন্যান পৌঁছুলো ট্রেন। পরের ষ্টেশন পান্ডুয়া, আমাদের গন্তব্য। পান্ডুয়া থেকে চার মাইল দূরে মন্ডলাই গ্রাম, আমার মামারবাড়ী। খন্যান এলে, ছেলে দুটো আরো দরজা আগলে দাঁড়ালো। আমার ভেতরটা হাহাকার করছে, নাম ছাড়া উপায় কি? এখন ঐ 'নামী'ই ভরসা। ট্রেন ছাড়বে বলে যেই সাইরেন পড়েছে হঠাৎই ট্রেনের বাইরে দরজায় জোরে জোরে আঘাত পড়তে লাগলো, কে দরজা বন্ধ করেছে, দরজা বন্ধ কেন, খোল শিগগিরি। ছেলে দুটো হকচকিয়ে দরজা তুলে দিল। দেখলাম একজন লম্বা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেন-কোটে ঢাকা মানুষ, হাতে একটা বড় টর্চ ও লাঠি নিয়ে ওঠলেন। উঠে ঠিক দরজার পাশটিতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরাও সুযোগ বুঝে সিট থেকে উঠে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেদিন যেন আকাশের সাথে সাথে আমার মনের আকাশও জোট বেঁধে ছিল। বাইরে বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। টিপ্ টিপ্ করে পড়ছে। আর আমার প্রেমময়ের পরশে আমার মনের কালো মেঘও সরে গেছে। ভয় আর দিদাকে হারানোর ব্যথাতে যিনি উপলক্ষ্য হয়ে এসে এই বিপদ মুক্ত করলেন তার দিকে আর ফিরে দেখা বা তাকে ধন্যবাদ জানানো আর হয় নি। তবে যাঁর দয়ায় এই বিপদ মুক্ত হয়েছিলাম, যতবার এই ঘটনা মনে পড়ে শিউরে উঠি ততবার তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি, আর ভেতর থেকে একটা ভালোলাগা ঘিরে ধরে, মনে মনে বলি দয়াল! এত ভালোবাসো আমায়!

ক্রমশঃ.....

প্রবন্ধ

মনের বিভ্রান্তি থেকে কি মুক্তি হয়?

শ্রী জগদিন্দু চক্রবর্তী

মনের বিভ্রান্তি একটা ভয়ঙ্কর দশা। বিভ্রান্তি থেকে আসে হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অর্থাৎ কি করা উচিত সেই বোধ বা বুদ্ধি হারিয়ে যাওয়া। আর এই থেকে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় গোলকধাঁধা। তখন বুদ্ধি হারিয়ে মানুষ যা খুশি করে বসে ও ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে। অবশ্য সে নিজে ভাবে যে সে যেটা করছে বা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা সবই ঠিক। নিজে কিন্তু বুঝতে পারেনা যে তার মন দিশাহীন হয়ে গেছে। মনের এই গোলকধাঁধা বা ফাঁদে মানুষ যখন ঢুকে পড়ে তখন তার আর নিস্তার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, মানুষ যখন কোন প্রবৃত্তির গহবরে পড়ে তখন তার যেন ভূতে পাওয়ার দশা হয়। প্রবৃত্তি নামক ভূত তার উপর ভর করে তাকে যেদিকে চালায় সে সে দিকেই যায় আর তাই করে। দিগ্বিদিক জ্ঞান তখন তার থাকে না। তখন সে কি যে ভাবে আর কি যে করে সে নিজে বুঝতে পারেনা। বিবেক তখন ছটফট করতে থাকে। প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

কোন মানুষ যখন 'লোভ ' নামক প্রবৃত্তি-ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সে ভয়ংকর বিপদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। লোভ বহু ধরনের হতে পারে---টাকার লোভ, কামের লোভ, ক্ষমতার লোভ, অন্য মানুষকে ছোট করার প্রবণতা ইত্যাদি বহু রকম। লোভ থেকে তৈরি হয় আসক্তি এবং যে একবার এই আসক্তির কবলে পড়ে তার আর উদ্ধার নেই। কি যে বিপদ হতে পারে তার কোনো সীমারেখা থাকে না।

পরনারীতে আসক্ত হয়ে হয়তো নিজের স্ত্রীরই জীবনহানি করে বসলো অথবা টাকার লোভে পরিকল্পনা করে এমন একটা ঘটনা ঘটালো যা তার নিজের জীবনকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল। 'হিংসা'ও ঐরকম আরেকটি ভয়ংকর ভূত। এরকম অসংখ্য ধরনের প্রবৃত্তি-ভূত মানুষের মনের মধ্যে বসবাস করে। তাই চলমান জীবনে মানুষ যদি তার নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারে তবে এই বিপদসংকুল দুনিয়ায় কখন যে সে হারিয়ে যাবে তার কি ঠিক আছে?

মন হলো অনন্ত সমুদ্রের মত যার তল খুঁজে পাওয়া যায়না। পৃথিবীর সবচাইতে গভীরতম অঞ্চল হল প্রশান্ত মহাসাগরের একটি জায়গায় অবস্থিত মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। মানুষের মন তার থেকেও অনেক অনেক বেশি গভীর ও উত্তাল। মনের ওই গভীরে কত রকমের প্রবৃত্তি-ভূত যে চুপটি করে বসে আছে তার কোন হদিশ মানুষ পায়না। কখন যে কোন প্রবৃত্তি ভেসে উঠে ঘাড়ের উপর ভর করবে তার কি কোন ঠিক আছে?

মানুষের মাথা সবসময়ই ছোট বা বড় যেকোনো ধরনের প্রবৃত্তিতে ডুবে থাকে তাই সে কখন কি বলে কখন কি করে তার কিছু ঠিক নেই। মাথা সঠিকভাবে কাজ করে না ও তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তাহলে পথ কি? মনের সবটুকু ইষ্টে নিবেদন করে নিজের কোন ইচ্ছাকে স্থান না দিয়ে তাঁর ইচ্ছায় জীবনকে চালানো ও তার ঋত্বিকের কাছ থেকে মতামত নেয়া। এছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে।

প্রবন্ধ

অমরত্ব কোন পথে ?

শ্রী অনুপ বৈদ্য

ছোটবেলা থেকেই একটা কথা আমরা সকলেই জেনে আসছি যে, মানুষ মরণশীল। শুধু মানুষ বলে নয়, যে কোন জীব উদ্ভিদ সকলেই মরণশীল। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে উচ্চতর চেতনার অধিকারী মানুষ। সে চায় সবকিছুকে জয় করতে, এমনকি মৃত্যুকেও। কিন্তু যে দেহ নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তা নশ্বর, একদিন না একদিন তা পঞ্চভূতে বিলীন হতে বাধ্য। দেহকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা হয়ত নানাভাবে সম্ভব হতে পারে কিন্তু তা অবিনশ্বর নয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সাধের এই দেহকে ত্যাগ করতেই হয় সকলকেই। তাই দেহ নিয়ে মানুষ অমর হয় না, হতে পারে না। কিন্তু অমরত্বের সাধ মানুষের চিরকালীন। যতদিন না মানুষ সত্যিই মৃত্যুর মুখোমুখী হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অমরত্বের আকাঙ্খা নিয়েই হয়ত মানুষ বেঁচে থাকে। এমনকি মনুষ্যেতর জীবেরও মৃত্যু হয়ত কখনই কাম্য নয়। তাহলে যেটা শাশ্বত, যেটা চিরন্তন তা হল এই যে, এই জৈবী দেহ নিয়ে মানুষের অমরত্ব লাভ কখনই সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল – অমরত্ব তাহলে কোন পথে?

সাধু মহাত্মাগণ যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন যে দেহ ছাড়াও মানুষের দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব আছে। এই আত্মা অবিনশ্বর, এর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এই অজর অমর আত্মা সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলছেন –

'নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণী নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। '

[সাংখ্যযোগ, শ্লোক ২৩]

– অর্থাৎ এক কথায় দেহাতীত এই আত্মাকে আগুন, অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

আবার রক্তমাংসের যে দেহ নিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে আসি তার সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

'বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়,
নবানী গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা,
নন্যানি সংযাতি নবানী দেহী।।'
[সাংখ্যযোগ, শ্লোক ২২]

অর্থাৎ সহজ কথায় – মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। সুতরাং জন্মমৃত্যুর এই চক্রে আমরা আবদ্ধ এবং আবর্তিত হয়ে চলি লক্ষ লক্ষ বার। জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাদের এই আসা-যাওয়া চলতেই থাকে। এখন এই দেহ এবং দেহাতীত আত্মা ছাড়াও আপাত অদৃশ্য অথচ উপলব্ধ একটি বিষয় হল আমাদের চেতন সত্ত্বা। এ ছাড়া দেহ, আত্মা সবই আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। অন্যভাবে বললে এই চেতনাই আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

সাধারণভাবে বর্তমান জীবনের কথা ভাবলেও আমরা দেখতে পাই ছোটবেলার বহু ঘটনাই আমাদের স্মৃতিপটে থাকে না। অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যধারার সংযোগ সময় সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এবং সেগুলিই আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সাধু-মহাত্মা, সদগুরুগণ বলেন যে, জীবনের সমস্ত ঘটনাই আমাদের স্মৃতিপটে, মস্তিষ্ককোষে সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং সেগুলি আমাদের জীবনকে প্রভাবিতও করে। এভাবেই কর্মফলের সৃষ্টি হয়। একইভাবে পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতিও স্বাভাবিকভাবে আমাদের চেতনধারায় থাকে না। নতুন দেহ নিয়ে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেশির ভাগ মানুষই পূর্বজন্মের যাবতীয় যা কিছু ঘটনাবলী বিস্মৃত হই। তাই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা ভাবি সবকিছুরই মৃত্যু হল, এমনকি আমাদের চেতন সত্ত্বারও। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা নয়, এমন কিছু কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত। পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই ধরণের জাতিস্মরদের নিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশীল চন্দ্র বসুকে দিয়ে বিস্তর গবেষণা করিয়েছিলেন। এতে প্রমাণ হয় মানুষের স্মৃতিবাহী চেতনা থাকা সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন যে, একটু চেষ্টা করলেই সাধন ভজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের চেতন ধারাকে জাগ্রত রাখতে পারি বা জাগিয়ে তুলতে পারি, এবং অবিচ্ছিন্ন চেতনধারা নিয়ে আমরা জন্ম হতে জন্মান্তরে যেতে পারি। ঠিক যেমন করে ঘুম থেকে উঠে আমরা সবকিছু আমরা আগের মত স্মরণ করতে পারি তেমনি মৃত্যুটাও তখন আমাদের কাছে ঘুমের মত মনে হবে।

এখানেই প্রকৃত অমরত্বের স্বাদ লুকিয়ে। এক জীবনে আমরা যাদেরকে নিতান্ত আপন ভেবে ছেড়ে যেতে চাই না, কষ্ট বোধ করি – সেই সকলে মিলে স্মৃতিবাহী চেতনার বলে বলিয়ান হয়ে জীবনের উপভোগকে হয়ত এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে পারি। প্রতিটি মানুষ অমর আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ার কারণেই অমরত্বের স্বাদ আমরা আস্বাদন করতে পারি না। এবং প্রত্যেকেই এই আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করে বাস্তব জীবনে যাতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্বস্তির অধিকারী হতে পারি পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সেটাই চাইতেন। তাই স্মৃতিবাহী চেতনা লাভের মাধ্যমে অমরত্বের সাধ পাওয়াই আমাদের জীবনের, আমাদের সত্ত্বার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা বলা যেতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর 'চলার সাথী' বাণীগ্রন্থে এই স্মৃতিবাহী চেতনা সম্পর্কে বলছেন – "আর, অধিগম্য যদি কিছু থাকে/ তা' হচ্ছে – স্মৃতিবাহী চেতনা – যা' জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া পরবর্তীতে পৌঁছাইয়া দেয়!" এই অমরত্ব অর্জন সকলের পক্ষেই সম্ভব। এবং প্রত্যেকেরই দৈহিক মৃত্যুর পরেও যে অন্যরকম এক অস্তিত্ব থাকে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারব। মৃত্যুজনিত বিয়োগ ব্যথায় হয়ত তখন আমাদের আর এত কষ্ট পেতে হবে না। জীবনে প্রিয় মানুষজনকে হারিয়ে যে দুঃসহ যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে বাধ্য হই, তা থেকে মুক্তির পথও এই স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ।

এমন কিছু কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যারা পূর্বজন্মের সুকৃতিবলে এই স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদেরকেই আমরা জাতিস্মর বলে চিহ্নিত করি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন – অটুট ইষ্টপ্রাণতার সহিত জ্ঞান বা জানার দিকে ঝোঁক অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস ও বেদাভ্যাস তৎপর হইয়া তপস্যা বা অভীষ্টলাভে প্রচেষ্টাপরায়ণ হওতঃ মানসিক ও শারিরীক শুচিতার সহিত প্রতি পারিপার্শ্বিকের উপকার প্রচেষ্টাপ্রবণ থাকিয়া অন্তরের দ্রোহভাবকে – অর্থাৎ অপকার করার ভাবকে তিরোহিত করে দাও – আর তোমার বিগত দৈনন্দিন কার্যগুলিকে অর্থাৎ এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছ – পর পর দৈনিক হিসাবে প্রাত্যহিক পশ্চাদপসারণী চিন্তা দ্বারাই হোক বা যথাসম্ভব সেই কর্ম সংস্কারগুলিকে স্মরণে আনিয়া বা সাক্ষাৎকার করিয়া স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চেষ্টা কর। ভগবান মনু ও মহর্ষি পাতঞ্জলের নির্দেশানুসারে এই হচ্ছে জাতিস্মরতা লাভ করিবার স্বাভাবিক উপায়।

যে জীবনবৃদ্ধিদ ধর্মের পালনের কথা শীশ্রীঠাকুর আমাদের বলেছেন সেখানে স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। "দদাতু জীবনবৃদ্ধি নিরন্তরং স্মৃতিচিদযুতে।"

রেসিপি

শীতের দুপুরে গরম ভাতের সাথে খাওয়ার দুর্দান্ত পদ
বাঁধাকপির বড়া দিয়ে তরকারি



উপকরণঃ

বাঁধাকপি, টমেটো কুচি,গোটা কাঁচালঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা বাটা আদা বাটা, বেসন, হলুদ গুঁড়ো ,লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়োপরিমাণ মত নুন, রান্নার তেল, সামান্য চিনি (স্বাদের জন্য)

বাঁধাকপির বড়া দিয়ে তরকারি তৈরির পদ্ধতিঃ

প্রথমেই একটা বাঁধাকপির অর্ধেক কুচি কুচি করে নিয়ে তাতে এক চামচ নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রাখলেই জল বেরোতে শুরু করবে। তখন হাতে চিপে সেই জল বের করে বাঁধাকপি আলাদা একটা পাত্রে নিয়ে নিতে হবে।

এই বাঁধাকপিতে পরিমাণ মত লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

ওই মিক্সের মধ্যেই আধ কাপ মত বেসন দিয়ে জল ছাড়াই ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে গোল বড়ার মত করে ভেজে নিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে।



ভাজা হয়ে যাবার পর সামান্য কিছুটা সরষের তেল কড়ায় রেখে তাতে ২টো গোটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাজতে থাকতে হবে।
ভাজা হয়ে এলে কড়ায় টমেটো কুচি দিয়ে তারপর পরিমাণ মত হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা, গরমমশলা গুঁড়ো, সামান্য চিনি, পরিমাণ মত নুন ও সামান্য জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে এককাপ মত জল দিয়ে তাতে সেটাকে ফুটতে দিতে হবে।
ফুটতে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা বাঁধাকপির বড়া কড়ায় দিয়ে দিন ও মিনিট ৩ - ৫ রান্না করুন।
ব্যাস তৈরী হয়ে গেল বাঁধাকপির বড়া দিয়ে তরকারি যেটা একেবারেই নতুন একটা খাবার যেটা খেতেও বেশ ভালো।

জীবনালেখ্য

পরম সন্ত তুলসী সাহেব

শ্রী জগদিন্দু চক্রবর্তী

হাতরাসের সন্ত তুলসী সাহেবকে সমস্ত সাধু সন্তগণ পরম সন্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন।*তিনি জন্মগ্রহণ করেন 1763 খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ারের অত্যন্ত উচ্চ অভিজাত রাজবংশে। এই রাজবংশ পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করতেন এবং সেজন্য তুলসী সাহেব প্রথম যুগে দক্ষিণা বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি ঘর ছেড়ে উচ্চকোটির সাধু মহাত্মার দর্শনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন । তুলসী সাহেবের বহু ভাষায় জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত, আরবী, পারসি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মৈথিলী ইত্যাদি ভাষায় তিনি অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। **"Tulsi Sahib, Saint of Hathras"** গ্রন্থে তুলসী সাহেবের এই অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে।

রাধাস্বামী মতের অর্থাৎ সন্ত মতের কবীরজী রচিত প্রথম অসাধারণ গ্রন্থ ‘অনুরাগ সাগর’ (ocean of love) তুলসী সাহেবকে গভীর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন, "সৎপুরুষই অনামী লোক থেকে এই সাধন তত্ত্বের গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। পরম পুরুষের চরম সত্য হল এই গ্রন্থটির উপজীব্য। সৎনামের সমস্ত তথ্যই এই গ্রন্থে লিখিত আছে যা প্রতিটি সাধকের জানা প্রয়োজন।

সন্ত দরিয়া সাহেবের কাছে তিনি এই উচ্চতম মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। দরিয়া সাহেব ছিলেন বিহারের সন্ত। দরিয়া সাহেবের লিখিত গ্রন্থ থেকে এটা জানা যায়। তিনিও তাঁর লিখিত গ্রন্থে অনামী শব্দ লোকের বিবরণ এবং সুরত শব্দ যোগের সমস্ত ধরনের কৌশল ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কবীরজীর উত্তরসূরী সন্ত ধরমদাস বহু মানুষের কাছে এই সৎনাম উন্মুক্ত করেন।

তুলসী সাহেবই প্রথম এই সাধন তত্ত্বকে সন্তমত নামে আখ্যায়িত করেন।

সুরত শব্দযোগের সাধনা সম্পর্কে পরম পুরুষ স্বত: সন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কি বলেছেন?

দেখুন, নির্গুণ সগুণরূপে, শব্দব্রহ্মরূপে প্রকাশ হবার পূর্বাবস্থা যাহা তাহাই "রা- স্বা"। "রা-স্বা" শব্দব্রহ্ম বলতে যা বোঝেন ঠিক তা নয় - নির্গুণ ও সগুণের latent ও potent-এর ঠিক মধ্যস্থ অবস্থা। যতদূর অনুভব করা যায়, বলা যায়-- তাহার শেষ ঐ "রা-স্বা" --তারপর থাকা বা না থাকা, অনুভব বা অনুনভব কিছুই বলা যায় না। সন্তরা 'উন-মুন-সুন' বলেছে যাকে। শব্দব্রহ্মের চেয়ে শব্দব্রহ্ম রূপে বিকাশ-উন্মুখ অবস্থা আরো উচ্চতর ও চরম নিকটবর্তী, কাজেই শব্দব্রহ্ম থেকে "রা-স্বা" শ্রেষ্ঠতর বটে--শব্দব্রহ্ম এর কারণ।

দেখুন, নিজে যা অনুভব করেছি তাই বলি। তা কারও সঙ্গে মেলে ভালো না মিললেই বা আমি কি করবো? শব্দব্রহ্ম বা অনাহত ধ্বনি যেরকম ভাবে অনুভব করা যায়, সেরকমভাবে আদি সত্য নাম অনুভব করা যায় না। ভজনাদি দ্বারা নিজ অভ্যন্তরে যেরূপভাবে ওংকার, রংকার, বেণু, বীণা আদি নাদ শ্রুত হয়, আদি সত্য নাম সেরূপ কোন নাদরূপে শ্রুত অর্থাৎ উহারা যেভাবে অনুভূত সেভাবে অনুভূত হয় না। উহারা যদি নাদ হয়, উহাদের কারণরূপী আদি স্পন্দন বা নাদ যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলেন তাহারই আবার স্পন্দনোন্মুখ অবস্থাই অর্থাৎ অনামী নির্গুণ হতে বিকাশোন্মুখ অবস্থাই আদি নাম--তবে অনুভব যোগ্য। উহাদের যেরূপভাবে অনুভব করা যায় তাহাপেক্ষা খুব finer-ভাবে ইহা অনুভব করা হয় বলে ওদের যে হিসাবে ধ্বনিত বলা হয় সে হিসেবে একে ধ্বনিত বলা যায় না। তবে লোককে তো ঐ idea মোটামুটি ভাবে এনে দিতে হবে! তাই কথায় ঐরূপ ভাবে বলা। ধ্বনি তো বটে তবে এত সূক্ষ্মভাবে যে ওদের তুলনায় ধ্বনিত নয়। শব্দব্রহ্ম বা শব্দধারা বা চৈতন্যধারা স্পন্দনের যেমন বিকাশ বা অবস্থা আদি নাম সেরূপ অবস্থা নহে! ওদের তুলনায় বিকাশোন্মুখ কিন্তু তাতেও স্পন্দন আছে; সে স্পন্দন নিজের মধ্যেই স্পন্দিতধারা রূপে বিকশিত, vibrating within itself, কথা বলে বড় করে অশ্বিনী দা বলে আপনাকে ডাকা আর মনে মনে আপনাকে ডাকা যেরূপ তফাৎ কতকটা অমনতর।

কথাটা বলা যে হিসেবে ধ্বনি, মনে-মনে বলাটা সে হিসাবে ধ্বনি নহে। বরং মুখে বলার আগে মনে মনে অশ্বিনী দা চিন্তা করাটা মুখে বলাটার কারণরূপী বিকাশোন্মুখ অবস্থা। তবে এতেও স্পন্দন থাকলো কিন্তু ওদের তুলনায় latent•••••এইরূপ আর কি। স্থূল অবস্থায় 'I' প্রকৃতির অধীন, ক্রমে সূক্ষ্ম হতে হতে 'I' প্রকৃতির কর্তা অর্থাৎ প্রকৃতি 'I'-এর অধীন--তখন সোহং জ্ঞান। আর ঐ আমির একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বোধ হওয়াটা যেন তার জাগ্রত অবস্থা। তারপর 'আমি' ক্রমে চেতনতন্দ্রাগ্রস্ত যেন হয়ে আসছে----- সত্য লোকের অবস্থা; তারপর 'I'-এর স্বপ্নাবস্থা। নিদ্রিত বটে, তবে completely সুষুপ্ত নয়; তারপর একেবারে সুষুপ্ত অনামী নির্গুণ, মোটামুটিভাবে এইরূপে বলা যায়।

তারপর আর একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, দেখুন ওঁ, হুঁ ইত্যাদি plane -এ উহা ছাড়া প্রাকৃতিক বা বাদ্যযন্ত্রদির শব্দের ন্যায় নাদ হয় বটে, কিন্তু যেগুলি বীজমন্ত্র হিসেবে গণ্য সেগুলিই ঐ ঐ plane-এর স্পন্দনগত শব্দ, মূল sound. অন্য গুলি তারই grosser manifestation, আসছে যাচ্ছে এইরূপ। স্পন্দনগতগুলিই অন্যগুলির জ্ঞান; ঐগুলিই main; যেমন একটা এস্রাজে কটা সুর মূল continuous, তাছাড়া আরও কতগুলি ঝংকার দেয়--সেই রূপ।

অমিয়-বাণী----শ্রী অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস-১২০-১২২ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করা হলো, একটু জপ ধ্যান করল, একটু ঘন্টার শব্দ শুনল, একটু জ্যোতি দেখল, তারপর আর সাধারণতঃ কেউ অগ্রসর হয় না। এর মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, চড়াই, খিঁচাই----এইসব কথা আছে না? "তড়প উঠে, বেকল রহুঁ" আছে না? ঐ আকুল টান না হলে কিছু হবার বা এগুবার জো নাই-ই। চাই ঐ আকুল টান বাড়িয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া। আমার যেমন হয়েছিল। ঐ একটা রোখ----ঐ নিয়েই থাকতাম। ঐ আকুলতা নিয়ে continue করা লাগে। ঐ অমনতর atmosphere সৃষ্টি করে এগিয়ে যাওয়া লাগে আকুল টানে । বলেছি তো সবই আপনাদের কাছে আমার যেমন হত।

[দিনপঞ্জী-২য় খন্ড-শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, 15ই অক্টোবর 1950, পৃষ্ঠা 83।]

**প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি আশ্রমে এসে বসেছেন। তখন প্রশ্ন করা হলো--এ নামকে অনামী -- 'রাধাস্বামী' বলে কেন? উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, প্রত্যেকটি বীজমন্ত্রের শব্দের পেছনে যে কম্পন রয়েছে সেই কম্পনের mechanism-টাই expressed হয়েছে আমাদের নামের ভিতর দিয়ে। তাই এই নাম প্রতি বীজনামের পেছনেই রয়েছে বলা যায়। "র "হচ্ছে কম্পনপ্রাণ বর্ণ। "র্ র্ র্ •••••" বললে মূর্ধা পর্যন্ত স্পন্দিত হয়ে ওঠে এমনতর, যা অন্য কোন বর্ণ উচ্চারণে অমনতর হয় না।

আর ধ্ ধ্ ধ্ ••••••হচ্ছে থামার প্রতীক।

"রধ্ রধ্ রধ্ •••••" হচ্ছে কম্পন প্রতীক------ যা উচ্চারিত হলে সমস্ত শরীরটা মায় brain-এর অভ্যন্তর ও মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ স্পন্দিত হয়ে উঠতে থাকে।

এই "র্" আর "ধ্" আকারান্ত করে দিলেই হয় "রাধা"। ---the continuity of a vibration express করতে এবং তা দিয়ে স্পন্দিত করে তুলতে brain cell-কে, ঐ "রাধা"-র মতন বাক্ প্রতীক আর নেই।

আর এই কম্পন ক্রমাগতি যে মূল motion(to and fro) হতে হচ্ছে, তাকে express করতে গেলে "স্বা" হচ্ছে expensive motion আর "মী" হচ্ছে contractive motion.

এইভাবে "স্বামী " is the symbolic expression of the original motion that brings in the vibration.

তাহলে "রাধাস্বামী" indicates the mechanism of a vibration with the causal motion.

আর এই স্পন্দনে physiologically সমস্ত মস্তিষ্ক কোষগুলিকে স্পন্দিত করে তুলতে অমনতর vital formula বা symbol আর হতে পারে না----আমাদের vocal instruments -এর বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বাক্ প্রতীকের দিক থেকে।

[দিনপঞ্জী ২য় খন্ড 19 অক্টোবর ----শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য**]

তুলসী সাহেব হাতরাসে সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি সুরত শব্দ যোগের সাধনা তাঁর মন্ত্র শিষ্যদের দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা দেন। আগ্রার শিব দয়াল সিং-এর পিতামাতা ছিলেন তুলসী সাহেবের ভক্ত এবং পরবর্তীকালে শিব দয়াল সিংও তুলসী সাহেবের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নেন। এই শিবদয়াল সিংই পরবর্তীকালে স্বামীজী মহারাজ বা রাধাস্বামী মহারাজ হিসাবে জগতের কাছে পরিচিত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, সন্তমত হল আসলে সনাতন মত। ঠিক তেমনই তুলসী সাহেব বলেছেন, এই সন্ত মত নতুন নয়, হাজার হাজার বছর থেকেই এই সন্তমত ভারতবর্ষে বিরাজ করছে। আমরা যাকে সনাতন মত বলি, তাই হল সন্ত মত।*

তুলসী সাহেবের লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঘট রামায়ণ, রত্ন সাগর, শব্দাবলী। *সন্ত সাধনার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের সংগীতের সুরের রাগ সম্পর্কিত অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন এই "শব্দাবলী" নামক গ্রন্থে। সুরের উৎস যে পরমধাম সে সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণমূলক গভীর তত্ত্বের ও তথ্যের সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন এই গ্রন্থে।

"আলোচনা প্রসঙ্গে" গ্রন্থে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রশিষ্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, "কথামৃত" পুস্তকে যেমন ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের আলোচনা ও উপদেশ লিখিত আছে, ঠিক তেমনি রত্ন সাগর গ্রন্থে তুলসী সাহেবের সঙ্গে তাঁর শিষ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কথোপকথন লিখিত আছে। এই গ্রন্থে এই সাধনার অনেক গূঢ় রহস্য উদঘাটিত করেছেন তিনি। এই পুস্তকে তুলসী সাহেব সৃষ্টি রহস্য, কাল, স্বর্গ ও নরক, কর্ম রহস্য এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র ভেদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। পরম ধামের বিস্তারিত বিবরণ ও সেখান থেকে নাদ-শক্তির নিম্নমুখী গতি ও ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডদেশ সৃষ্টির কলাকৌশল (mechanism) ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে। সুরতের প্রকৃতি ও তার ঊর্ধ্বগতি কিভাবে সৃষ্টি করা যায় এই সাধনার মাধ্যমে তার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থের একটি বিশেষ দিক।

"ঘট রামায়ণ" গ্রন্থে তুলসী সাহেব সৃষ্টিতত্ত্বের নিরিখে রামায়ণের বিশ্লেষণ করেছেন। এ এক অসাধারণ বিশ্লেষণ যা আগে পৃথিবীতে কেউ করেননি। ঘট রামায়ণ এক অনবদ্য সৃষ্টি যার কোন তুলনা নেই।*

তুলসী সাহেব সুরত-শব্দ যোগের সাধনার এক নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। এই সুরত-শব্দ যোগের সাধনার মূল তত্ত্ব হলো আকাশে সুরতের বিচরণ ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির আদি ধ্বনির মূর্ছনা শ্রবণ এবং রহস্যময় আলোর দর্শন। এই নাম হল ধূনাত্মক অর্থাৎ শুধুমাত্র নাদের ধূন টের পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সুরত কারণ স্তরের একেবারে শেষ সীমানায় অর্থাৎ দয়াল দেশে পৌঁছায় এবং সৃষ্টির আদি অবস্থা দর্শন ও শ্রবণ করে।

*এস. ডি. মহেশ্বরী তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থ "পরম সন্ত তুলসী সাহেব" -এ লিখেছেন, "তুলসী সাহেব প্রায়ই সমস্ত শরীর একটি কম্বল দ্বারা আবৃত করে হাতরাস থেকে অনেক দূরে কোন পর্বতের নির্জন স্থানে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ভজন নিরত অবস্থায় কিছুদিন থাকতেন। প্রায়ই ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সমাধি ঘটত। ঘট রামায়ণ ছাড়াও তিনি অসংখ্য ছড়া বাণী সমন্বিত গ্রন্থ "শব্দাবলী এবং রত্ন সাগর" রচনা করেন হাতরাসে অবস্থানকালীন সময়ে। তাঁর রচিত এই অমূল্য গ্রন্থগুলি প্রেমভক্তি ও সাধনার বিবরণ সমন্বিত এক অনবদ্য অবদান।

সাধন পথের গভীর ও গুপ্ত কলাকৌশল এখানে এমনভাবে বর্ণিত আছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসাধ্য। আমাদের এই সাধনপথে যারা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন এখানে বর্ণনা-করা কলা কৌশলের তত্ত্ব। "ভজন"-এর গূঢ় তত্ত্বও এই গ্রন্থ গুলিতে অপূর্ব ছন্দে তিনি মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন।

তুলসী সাহেব আর একটি গ্রন্থ "পরম সাগর" লিখেছিলেন যেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় কারণ তার আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। এই অসম্পূর্ণ "পরম সাগর" গ্রন্থটিতে পরমপুরুষের পরমধামের অপূর্ব বর্ণনা আছে যা পাঠ করলে সাধকের মন পরমধামের পরম সাগরে অবগাহিত হয়। এই পরমসন্তের মহাপ্রয়াণ ঘটে 1843 সালে।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা

পেঁপের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

পেঁপে একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। পুষ্টিগুণ বিবেচনায় পেঁপে অনেক ফলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তাই পেঁপের আরেক নাম পাওয়ার ফ্রুট। কারণ, এতে রয়েছে অনেক রোগের নিরাময় ক্ষমতা। সহজলভ্য এবং কম দামে পাওয়া যায় বলে এর জনপ্রিয়তাও অনেক। পেঁপে কাঁচা ও পাকা দুই ভাবেই খাওয়া যায়। কাঁচা পেঁপে স্যালাডে ও রান্নায় এবং পাকা পেঁপে ফল হিসেবে খাওয়া যায়। এর পেপেইন নামের উপাদান আমিষকে হজম করে সহজেই এবং পরিপাক তন্ত্রকে পরিষ্কার করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়ঃ

এই ভিটামিনগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শরীরের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে। এতে উপস্থিত ভিটামিন সি ত্বক, চুল ও মাড়ির জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া পেঁপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ যা চোখের জন্য উপকারী।

হজমশক্তি বাড়ায়ঃ

পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম আছে যা খাবার হজমে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও প্রচুর পানি ও দ্রবণীয় ফাইবার আছে। যারা হজমের সমস্যায় ভুগে থাকেন তাঁরা নিয়মিত পাকা বা কাঁচা পেঁপে খেতে পারেন। এক্ষেত্রে পেঁপে খুব উপকারি।

ওজন কমায়ঃ

প্রাকৃতিকভাবে আমাদের অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে পেঁপে। পেঁপেতে ক্যালোরির পরিমাণ খুব কম থাকে এবং উপকারী ফাইবার বা আঁশ বেশি থাকে বলে যারা ওজন সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা পেপে খেতে পারেন নিয়মিত।

কোলেস্টেরল কমায়ঃ

পেঁপেতে কোনো কোলেস্টেরল নেই। আর পেঁপেতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ধমনীতে কোলেস্টেরল জমতে বাধা প্রদান করে। অন্যান্য কোলেস্টেরল যুক্ত খাবারের বদলে পেঁপে খান। তাহলে আপনার কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ত্বকের জন্য উপকারীঃ

ত্বকের জন্য পেঁপে অনেক উপকারী। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, একজিমা রোধ করতে, এবং ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পেঁপে খুবই উপকারী।

ভিটামিন বি এর অভাব পূরণ করেঃ

পেঁপেতে আছে ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি- ৬, এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফলেট নামের একটি উপকারি ভিটামিন আছে। তাই ভিটামিন বি এর অভাব পূরণ করার জন্য নিয়মিত পেঁপে খাওয়া উচিত।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যারোটিনের উৎসঃ

পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিটা ক্যারোটিন, ফ্লেভানয়েড, লুটেইন, ক্রিপ্টোক্সান্থিন আছে যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ক্যারোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যান্সারের ঝুঁকির হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করেঃ

চিনির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পেঁপে একটি আর্দশ ফল। যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদেরও প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পেঁপে রাখা উচিত। পেঁপে ডায়াবেটিস হওয়া প্রতিরোধ করে।

হাড় মজবুত করেঃ
পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং কপার রয়েছে, নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার ফলে শরীরে ক্যালসিয়াম তৈরি হয় যা হাড় মজবুত করে। তাছাড়া আর্থারাইটিস, অস্টিও আর্থারাইটিস দূর করতে সাহায্য করে পেঁপে।

ক্যান্সার প্রতিরোধকঃ
পেঁপে ক্যান্সার নিরাময়েও ভূমিকা রাখে, পেঁপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফ্ল্যাভোনোক্সিড যা দেহে ক্যান্সারের কোষ তৈরিতে বাধা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে পেঁপের বিটা কেরোটিন উপাদান কোলন ক্যান্সার, প্রোসটেট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

উচ্চরক্তচাপ কমায়ঃ
পেঁপে আমাদের দেহের সঠিক রক্ত সরবরাহে কাজ করে। আমাদের দেহে জমা থাকা সোডিয়াম দূর করতে সহায়তা করে যা হৃদপিণ্ডের রোগের জন্য দায়ী। উচ্চরক্তচাপ আক্রান্তরা কাঁচা বা পাঁকা পেঁপে খেতে পারেন। দুটোই উপকারী।

তাছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের আরোগ্য ক্ষেত্রে পেঁপের ভূমিকা অনেক। নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার ফলে শ্বাস- প্রশ্বাসের সমস্যা কমে যায়। দাঁতের যন্ত্রণার অব্যর্থ ওষুধ হল পেঁপে। অন্ত্রের কৃমি রোধ করে পেঁপে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাঁরা পাকা পেঁপের বদলে কাঁচা পেঁপে খান। কারণ পাকা পেঁপে খেলে ডায়াবেটিস বেড়ে যেতে পারে।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বিস্ময় মানুষের অজানা জীবন

শ্রী জগদিন্দু চক্রবর্তী

পর্ব-৩

তাঁর কাছে বসে আছে ধাইমা। বাড়ির সবাই উৎকন্ঠিত। রাত্রি প্রায় অবসান। হঠাৎ তীব্র বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল ঝলক বয়ে গেল বাড়িটায়। ধাইমা তাকিয়ে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়েছে দিব্য দেহধারী মুণ্ডিত-মস্তক এক বিস্ময় শিশু। সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে আলোয়। শিশুর দেহ থেকেই বিকিরিত হচ্ছে আলো। তার সাথে আনন্দে ঢেউয়ে ভেসে গেলেন পরিবারের সবাই। সে এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব, যিনি খুব অল্প বয়সে পাবনা হিমাইতপুর আশ্রমে শ্রীভগবানের অভয়ামৃত শ্রীচরণতলে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে সেই মুহূর্তের যে বিবরণ শুনেছিলাম তা কিছুটা অন্যরকম।

পরমপিতা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিঃশব্দ বজ্রপাতের মতো বিশাল আলোর ঝলকানি হয় সমগ্র হিমায়েতপুর গ্রামেই আলোর ঝলক মুহূর্তেই বয়ে যায়। তার সঙ্গে একটা আকাশ ছোঁয়া আগুনের স্তম্ভ দেখা যায়। পদ্মা নদীতে যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা নৌকায় মাছ ধরছিল তারা স্তম্ভিত ও ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। আগুন ধরেছে ভেবে তারা বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এবং দেখে সমস্ত বাড়িটা আলোর কিরণে ভেসে যাচ্ছে। তারা বিষ্ময়-শিশুকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে ও বারান্দার মেঝেতে প্রণাম করে।

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পরে যেমন angel(দেবদূত) গিয়ে মেষপালকদের সংবাদ দিয়েছিলেন তেমনি এক্ষেত্রে প্রকৃতি নিজেই পরমপুরুষের আগমনী সংবাদ পৌঁছে দিল সাধারণ মানুষের কাছে।

যীশুখ্রীস্টের জীবনের অলৌকিক মহিমা সত্যাসত্য বাস্তবতা নিয়ে যেমন আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে চলেছেন ঠিক তেমনি একদিন হয়তো পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মের বিস্ময়-মুগ্ধ বৃত্তান্ত ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়বস্তু হবে সেদিন হয়তো আরো নতুন কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনার উপাদান আবিষ্কৃত হবে।

প্রভু যীশুর ১৩ বছর বয়স থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত অন্তর্ধান রহস্য

=====================================

ভগবান যীশু ১৩ বছর বয়স থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনে একটা বড় অধ্যায় সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট কোনরকম বর্ণনা না থাকায় মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজানা থেকে গেছে। ঈশ্বর পৃথিবীতে এসে ধর্ম প্রচার না করে কাঠের কাজ করে এতগুলো বছর কাটালেন তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এরকম একটা কথা চালু আছে যা কখনোই যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না।

সুদীর্ঘ সময় ধরে বহু ঐতিহাসিক যীশুর অপ্রকাশিত জীবনের এই অজানা অধ্যায় নিয়ে গভীর গবেষণারত। বহু ধর্মপ্রচারকও এই অনাবিষ্কৃত জীবন নিয়ে গবেষণা করেন।

এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য গবেষণা করেন রাশিয়ান ঐতিহাসিক নিকোলাস নটোভিচ্। নিকোলাস নটোভিচ্ রাশিয়ার ক্রিমিয়ার অন্তর্গত কার্চ নামক স্থানে ১৮৫৮খ্রিস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত, সুলেখক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক এবং পামির মালভূমির মত দুর্গম অঞ্চলের পর্যটক। তিনি পৃথিবীর বহু ভাষার জার্নালে বহু রকম বিষয়ের ওপর লিখেছেন । তাঁর এইসব বহুমুখী প্রতিভার ও কৃতিত্বের আলোচনায় প্রবেশ না করে এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ও আলোচ্য বিষয়ে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনাই আবশ্যক।

১৮৮৭ সালের শেষার্ধে নিকোলাস ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে লাদাখ অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং কিছু লোকলস্কর ও দোভাষী সমেত ক্যারাভান (caravan) নিয়ে অক্টোবরের ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় লাদাখ পরিভ্রমণ শুরু করেন। ভীষণ সাহসিকতায় ভর করে ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল পথ এবং হিমাঙ্কের অনেক নিচের তাপমাত্রা ও শীতল হিমালয়ের অবিশ্বাস্য দুর্গমতা অগ্রাহ্য করে পৌঁছেছিলেন লাদাখে। তখনকার দিনে আজকের মত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না এবং তার ফলে লাদাখে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।

তখনকার দিনে শ্রীনগর থেকে লাদাখ যেতে গেলে ভীষণ দুর্গম সাড়ে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত জো--জি--লা পাস নামক গিরিপথ দিয়ে যেতে হতো।

১৮৮৭ সালের ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় নিকোলাস নটোভিচ্ পৌঁছান শ্রীনগরে। শ্রীনগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ডাল লেকে অসংখ্য ভাসমান সুসজ্জিত বাড়িঘর দেখে তিনি অভিভূত হন। এই ভাসমান বাড়িগুলোতে বিভিন্ন পরিবারের বাস দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর কোনো দেশেই এই অপরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না। এইসব অভাবনীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বেশ কিছুদিন শ্রীনগরে অবস্থান করেছিলেন। এই সমস্ত বর্ণনা তিনি ফ্রেঞ্চ(French) ভাষায় লিখিত la via inconnue De Jesus ১৮৯৫ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় এবং পরের বছরেই ইংরাজী অনুবাদ 'Unknown life of Jesus' অর্থাৎ 'যীশুর অজ্ঞাত জীবন' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ২৭শে অক্টোবর মধ্যাহ্নে নটোভিচ্ লাদাখের বরফাবৃত রাজধানী লে যাত্রা করেন ও ২৯শে অক্টোবর লে-র বিখ্যাত হেমিস্ গুম্ফার নিকট অঞ্চলে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। তাঁর একটি পা ভেঙ্গে যায় এবং হেমিস্ গুম্ফাতেই বৌদ্ধ চিকিৎসা মতে তাঁর চিকিৎসা হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পৃথিবীর বিখ্যাত বৌদ্ধ গুম্ফা হল এই হেমিস্। এখানে বহু হাজার বছরের অনেক মূল্যবান ইতিহাস-সমৃদ্ধ পুঁথি সংগৃহীত আছে। এখানে প্রধান লামার অনুমতিক্রমে আরেকজন সন্ন্যাসী বহুকালের প্রাচীন একটি পুঁথি বার করেন, যার পৃষ্ঠাগুলো দীর্ঘ প্রাচীনতায় হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মূল গ্রন্থ প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত। এটি তারই তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ। সন্ন্যাসী গ্রন্থটি পাঠ করে শোনাতেন ও নটোভিচ্ তা ফরাসি ভাষায় লিখে নিতেন। এভাবেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'যীশুর অজ্ঞাত জীবন' (Unknown life of Jesus) সৃষ্টি হয় বরফ রাজ্যে ভ্রমণের ভয়াবহ কষ্ট এবং দুর্ঘটনাজনিত যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি ভগবান যীশুর ১৪ বছর বয়স থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাইবেলে অলিখিত জীবন কাহিনী এবং ক্রুশবিদ্ধর পরবর্তী পুনরুত্থান ও ভারতে আগমন সম্পর্কিত কাহিনী উদ্ধার করেন।

নটোভিচের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টান দুনিয়ার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবি মহল ও সমস্ত চার্চ ভয়ংকর প্রতিবাদ শুরু করে। ম্যাক্স মুলারের মত জার্মান বুদ্ধিজীবী ঘোষণা করেন------- নটোভিচের এই কাহিনী কল্পনাপ্রসূত, উন্মাদের সৃষ্টি এবং এটি একটি প্রতারণা। ভগবান যীশু ভারতে এসেছিলেন এই কথা খ্রিস্টান দুনিয়া মানতে রাজি নয়। নটোভিচকে ভয়ঙ্কর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় ও তাঁর জীবন সংশয় দেখা দেয়।

রাশিয়ান সরকার তাঁকে বন্দী করে ও বিপজ্জনক দেশ তুষারাবৃত সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। ১৮৯৭ সালে তাঁর নির্বাসনের অবসান হয়। সাইবেরিয়ার ভয়ঙ্কর তুষার রাজ্যে নির্বাসিত অবস্থায়ও তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন যা তখনকার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জার্নাল 'la science Francaise'-তে লেখকের নাম ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়। তিনি সাইবেরিয়ায় অত্যাচারিত ও নিগৃহীত জীবনকাল নিয়ে একটি উপন্যাস 'Uve Francise ensiberia' লেখেন। এতকিছু অত্যাচার ও নির্যাতনের পরেও তিনি প্যারিসে একটি প্রকাশনা সংস্থা খোলেন ও পাক্ষিক জার্নাল 'La Russie' প্রকাশ করেন। এটি নিয়মিত প্রকাশিত হত। ১৯১০ সালে 'The life of Saint Isha' (সন্তপুরুষ ঈষার জীবনী) নামে আরেকটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৯৯ সালের ২রা জুন ফ্রান্স তাঁকে অত্যন্ত উচ্চমানের সম্মান প্রদান করে। তাঁকে 'Societe d' historic Diplomatiquei' এর সদস্য করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের আক্রমণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন ও ১৯১৬ সালের পরে নিজেকে সবকিছু থেকেই সরিয়ে নেন ও নীরব অবস্থান গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ